মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী ও বালাকোটের যুদ্ধ

মূলঃ ঃ হযরত মাওলানা শাহ আবুল হাসান ফারুকী দেহলভী
অনুবাদ ঃ লোকমান আহমদ আমীমী

মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী 'তাকভিয়াতুল ঈমান' নামক কিতাব লিখে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের অনুসরণের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আর তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল জিহাদী আন্দোলন। কেননা তিনি দেখেছেন যে, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের তখনই সফলতা এসেছে, যখন তিনি শক্তিশালী সাহায্যকারীর সাহায্য লাভ করেছেন। মাওলানা ইসমাঈল জিহাদের ক্ষেত্রগুলো প্রস্তুত করেছিলেন। প্রাথমিক ধাপগুলো সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করেছেন। তিনি পীর-মুর্শিদ, সংগী-সাথীদেরও নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যেহেতু আন্দোলনের পেছনে নজদী চিন্তাধারা কাজ করেছে, সেজন্য এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

৭ই জমাদিউল উখরা সোমবার ১২৪১ হিজরী মোতাবেক ১৭ই জানুয়ারী ১৮২৬ ঈসায়ী মাওলানা ইসমাঈল নিজ মুর্শিদ জনাব সাইয়িদ আহমদ আর মুজাহিদীনের একটি জামায়াত নিয়ে রায়বেরেলী থেকে জিহাদ উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। গোয়ালিয়র, আজমীর, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, কান্দাহার, মাকরু, গযনী, কাবুল, হাফত আসিয়ার, চার বাগ, জালালাবাদ, পেশোয়ার হয়ে চার সাদ্দাহ এলাকার হাশত নগরে পৌঁছেন।(১) তখনও এক মাস সময় অতিবাহিত হয়নি, তিনি নিজের পীর-মুর্শিদকে বরহক ইমাম এবং আমীরুল মুমেনীন বানিয়ে দিলেন।

এ প্রসংগে মাওলানা ইসমাঈল লিখেছেন ঃ যে ব্যক্তি জনাবের ইমামতকে প্রথমেই কবুল না করে, বা কবুল করার পর অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি এমনি বিদ্রোহী যাকে হত্যা করা হালাল এবং যাকে কতল করা কাফিরদের কতল করার মত জিহাদ। তাঁকে (হতক) অপমান করা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অপমানের মত বান্দাদের রবের আসল মরযী। কেননা এ সব লোক মুতাওয়াতির হাদীসের হুকুম অনুযায়ী অভিশপ্ত ও মন্দব্যক্তির শামিল। এ সম্বন্ধে অধীনের নীতি এই। কাজেই অভিযোগকারীদের অভিযোগের উত্তর লিখাও বক্তৃতা নয় বরং তরবারীর আঘাত।

(মকতুবাত সাইয়েদ আহমদ শহীদ)

মোহাম্মদ ইবনি আবদুল ওহাব নিরীহ মুসলমানদের রাতে অতর্কিত হামলা এবং হত্যা করার জন্য খারিজী প্রভৃতিদের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মাওলানা ইসমাঈল চার সাদ্দাহ পৌঁছেই ওই নিয়ম-নীতি গ্রহণ করলেন এবং নিরীহ মুসলমানদের কতল করার ফতওয়া দিলেন।

মাওলানা ইসমাঈলের এ ধরনের লেখাগুলো সবার সামনে রয়েছে। তিনি সাইয়িদ আহমদকে ইমাম বলে ঘোষণা করলেন আর ইমামতের অস্বীকারকারীকে দোযখী এবং কতল করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করলেন। আমাদের বুঝে আসে না, মাওলানা ইসমাঈল রাফিযীদের নীতি গ্রহণ করেছেন নাকি খারিজীদের নীতি গ্রহণ করেছেন। ইমামতের মাসয়ালা হলো রাফিযীদের, আর কবীরা গুনাহকারীদের হত্যা করা হলো খারিজীদের নীতি। সুতরাং এ

[(১) জমাদিউল উলা ১২৪২, ডিসেম্বর ১৮২৬]

অসৎগণই হযরত আলী (রাঃ)-কে শহীদ করেছিল। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের লোকেরা ইমামতের ঝগড়া দাঁড় করায়নি এবং কবীরা গুনাহকারীকে হত্যা করাও ওয়াজিব বলেনি।

আমাদের সামনে মহানবী (সঃ)-এর খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর ঘটনা রয়েছে। হযরত সায়াদ ইবনি ওবাদা আনসারী (রাঃ) উচ্চ শ্রেণীর সাহাবী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহ! তোমার খাস রহমত ও শান্তি ইবনি ওবাদার পরিবার-পরিজনের ওপর নাযিল কর।'

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর হাতে সবাই বাইয়াত হলেন কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এবং কয়েকজন সাথী ছয় মাস পর্যন্ত বাইয়াত করেন নি। পরে তাঁরা বাইয়াত করেছেন। হযরত সায়াদ ইবনি ওবাদাও বায়াত করেননি। তিনি মদীনা মোনাওয়ারা হতে হাওরান চলে যান, সেখানে চৌদ্দ বা পনের বছর পরে ইনতিকাল করেন। উপরোক্ত দু'জনের বিরুদ্ধে সেজন্য কোন অভিযোগ আনা হয়নি।

অন্য একটি বর্ণনায় সে সময়ের ভ্রান্ত পদক্ষেপের কথা জানা যায়। এখানে এ ভুল হয়েছিল যে, শাহ সাহেবের ফয়সালা অর্থাৎ বোর্ডের প্রকৃত রহস্য না বুঝে সাইয়িদ সাহেবকে আমীরে মোতলক অর্থাৎ একনিষ্ঠ ইমামের মর্যাদা দান করা হয়েছিল। এটা ওই সব লোকের হস্তক্ষেপের দরুন হয়েছিল, যাঁরা ইমাম আব্দুল আযীযের শিক্ষা প্রাপ্ত ছিল না। এ পরাজয়ের পেছনে মৌলিক পরিবর্তনের হাত রয়েছে।' ... ...

'তারা নজদী ও ইয়ামনী ওলামাদের শাগরিদ ছিল। তাদের অব্যাহত অন্যায় কড়াকড়ি বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। শহীদ আমীর যায়দি শিয়াদের দল থেকে বের করে দেন। তবুও অশান্তির আগুন বেড়েই চলে।'

(হিযবি ইমাম ওলীউল্লাহ দেহলভী কী ইজমালী তারীখকা মোকাদ্দামা মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধী)

শায়খ বিলায়িত আলী সাদেকপুরী দাবী করেছেন ঃ ইমাম আমীরই মাহদী মওউদ। তিনি লড়াইয়ে শহীদ হননি, বরং জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে আছেন। আর তিনি এ জগতেই বিদ্যমান আছেন।' (মাওলানা সিন্ধী)

মীর মাহবুব আলী লিখেছেন ঃ 'জনাব সাইয়িদের শাহাদাত সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাঁর এক শ্রেণীর অনুসারীদের ধারণা—তিনি জীবিত আছেন এবং ওই পাহাড় সমূহে যেখানে ওজর গোত্রের লোকেরা বাস করে সেখানে তিনি লুকিয়ে আছেন। তিনি কাঁদছেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন যেন তিনি গায়বি মদদ করেন। অন্যদের ধারণা মাওলানা ইসমাঈলের শাহাদতের পরে তিনি শহীদ হয়ে যান। একই দিনে যিলকদ্দ মাসে উভয়ে শাহাদত বরণ করেন। আর সাইয়েদ, হাফিয করম আলীর বর্ণনানুসারে মাওলানা ইসমাঈলের শাহাদাতের বাইশ দিন পর জনাব সাইয়িদ যখন নামায পড়ছিলিন, সে মুহূর্তে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়। আর তাঁর শির কেটে লাহোর পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ যুদ্ধে ১২৪৬ হিজরীতে শিখদের সাথে সংগঠিত হয়। আর আল কাসিমুল কাযযাব পানিপথী এবং তাঁর সহযোগীরা বলেন ঃ যে ব্যক্তির ধারণা জনাব সাইয়িদ সাহেবের ওফাত হয়ে গেছে এবং অন্য ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীন হওয়া বৈধ, সে ব্যক্তি খোলাখুলি গুমরাহ।'

মীর মাহবুব আলী, মাওলানা ইসমাঈলের সহপাঠী ছিলেন। তিরমিযী শরীফের হাম-সবক ছিলেন। মীর মাহবুব আলী তদীয় লিখিত 'তারীখুল আইম্মাতি ফী খোলাফায়িল উম্মত' গ্রন্থে

বিস্তারিত আলোচনার পর লিখেছেন ঃ জনাব সাইয়িদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব ছিল। তিনি মুজতাহিদও ছিলেন না। কাজেই খিলাফত ও ইমামতে অস্বীকারকারীকে হত্যা করা না জায়েজ হয়েছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ মাওলানা ইসমাঈল এ জিহাদকে অমুসলমানের দিক হতে মুসলমানের দিক ঘুরিয়ে দেন। সাইয়িদ আহমদ শহীদের ৪৪ নম্বর মাকতুব বা চিঠিতে জানা যায়—ওই এলাকার আলিম, ফাযিল ও সালিহদের সন্দিহান হওয়ার পেছনে মাওলানা ইসমাঈল এবং তাঁর সাথীদের ওহাবী ও গায়র মুকাল্লিদ হওয়াই অন্যতম কারণ ছিল। যা'হবার তা হয়ে গেছে। শাহ আবদুল আযিয এবং শাহ আবদুল কাদির, মাওলানা ইসমাঈলকে নসীহত করছিলেনঃ 'রফি'ইয়াদাঈন ছেড়ে দাও। খামখা অশান্তির সৃষ্টি হবে।' মাওলানা ইসমাঈল তাঁদের নসীহতের ওপর আমল করেননি। বরং তাকভিয়াতুল ঈমান লিখে মুজাদ্দিয়তের পথ গ্রহণ করেছেন। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সীমান্ত প্রদেশের আলিমগণ দেখেছেন। তাই তাঁদের সুধারণার সমাপ্তি ঘটল। কথিত আছে, জনাব সাইয়িদের নির্দেশে মুজাহিদীনরা পাঠান মেয়েদের (যবরদস্তী) বিবাহ করত। এ সম্পর্কে জাফর থানেশ্বরী লিখেছেনঃ 'বিভিন্নস্থানে এ বদরুসম বন্ধ হতে লাগল এবং হাজার হাজার কুমারী মেয়ে স্বামী লাভ করল।' (তাওয়ারীখে আজীবা) পাঠানদের সম্পর্কে এ ধারণা তারা মেয়েদের বিবাহ দেয়না, এটা একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। অবশ্য তাদের মধ্যে শত শত বছর থেকে যে নিন্দনীয় নিয়ম চালু আছে, তা' হলো মেয়েদের মোহর মেয়ের পিতা, ভাই প্রমুখ আত্মসাত করে। আজ পর্যন্ত এ প্রথার উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি।

বিবাহ সম্পর্কে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী কাবুলের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিকট থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 'আফগানিস্তানের শরীফগণ অন্যান্য গোত্রের শরীফদের সাথে আত্মীয়তা করা দূষণীয় মনে করত না। মুহাজিরগণ নিজের সংগে পরিবার নিয়ে যায় নি। যখন তারা আফগান এলাকায় স্থানীয়ভাবে বসবাস করতে লাগল, তখন আফগানীদের সাথে তাদের বিবাহ-শাদী হতে থাকে। কিন্তু আমীরে শহীদের খিলাফতের দাবী প্রচারকারী হিন্দুস্থানীরা প্রশাসনিক ক্ষমতা দেখিয়ে যবরদস্তিতে আফগানী মেয়েদের বিবাহ করতে লাগল। এ ব্যাপারে তারাই বেশী অপরাধী যারা শাহ ওলী উল্লাহদের শিক্ষা প্রাপ্ত সিপাহী ছিল না। এবং নিজ ধর্মীয় জোশে নিজস্ব চিন্তা ধারার প্রেরণায় আমীরের যথাযথ আনুগত্য করত না। এরা—লা-তায়াতালিমাখলুকিনফী মায়াখিয়াতিল খালিক অর্থাৎ স্রষ্টার নাফরমানী করে মখলুখের আনুগত্য করা নিষিদ্ধ। এ বাণীকে নীতি গলদভাবে ব্যবহার করতে থাকে। তাদের দৃষ্টান্ত ইউরোপের অনারকাষ্টদের মত ছিল। যারা এ বিপ্লবীদের সাথে শরীক হয়েছিল, তারা বিপ্লবীদের চরম ক্ষতিসাধন করে ছাড়ল। (হিযব ইমাম ওলী উল্লাহ কী ইজমালী তারীখ কা মোকাদ্দামা)

এখানে লক্ষণীয় যে, জনাব যাইয়িদের ইমামতকে অমান্যকারীদের মুনাফিক এবং কাফির সাব্যস্ত করে হত্যা করা হত এবং তাদের মাল-পত্র গণীমতের মাল মনে করা হত। অন্যদের মেয়েদের যবরদস্তি নিয়ে এনে তাদের সাথে বিবাহ করা হত। এধরনের কাজে ওরাই লিপ্ত হতে পারে যারা কোন মাযহাবের পাবন্দ এবং মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে কারো অনুসারী নয়। উপজাতীয়রা আরো দেখল—এদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চঃ শব্দে 'আমীন বলে, কেউ কেউ 'রফয়ি ইয়াদাঈন' করে। এ সব হলো গাইরি মুকাল্লিদের লক্ষন।

এ নীতিবাজগণ নজদী ওহাবীদের নীতি গ্রহণ

করেছে। 'আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত' হযরত আলী (রাঃ)-এর নির্দেশ পালন করেছে। ৩৭ হিজরীতে যখন হযরত আলী (রাঃ)-এর জামায়াতের মধ্য হতে একটি সম্প্রদায় তাঁর বিরোধী হল এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল; তখন এ দলের চারশ' জন মারা গেল। হযরত আলী (রাঃ) নিহত ও আহতদেরকে তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে অর্পণ করলেন। এবং নিজের লোকজনকে বললেন ঃ যুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তোমাদের হস্তগত হয়েছে, তা' তোমরা নিয়ে যাও। আর তিনি পরাজিতদের মাল-পত্র, দাস-দাসী তাদের পরিবার পরিজনদের নিকট সোপর্দ করলেন। (তারীখুল ইমাম ও মুলুক-৪র্থ খঃ ইমাম তাবারী)

জিহাদী আন্দোলনের ব্যর্থতা ও মুজাহিদীনের ধ্বংসের কারণ বর্ণনা প্রসংগে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী লিখেছেন ঃ কাবুলে অবস্থানকালে বিপর্যয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছি। এর সূচনা খুশীগীর খানদান থেকে হয়। তাঁর মেয়ে যবরদস্তীর শিকারে বিবাহ হয়েছিল। এর মধ্যে খটকের খান, খুশীগীর খানের সাথে সন্ধি করেছিলেন। উভয় খানদানের মধ্যে বংশগত শত্রুতা ছিল। এর ফলে শত্রুতা বিদূরিত হয়। খুশীগীর খানের এক মেয়েকে জনৈক হিন্দুস্থানী যবরদস্তীতে বিবাহ করেছিল। তিনি ঘটকের খানকে বললেন ঃ আমার দাবী আমি ত্যাগ করলাম, কেননা এখন আফগানীদের ইয্যতের প্রশ্ন। আমাদের পরস্পর সন্ধি হয়েছে এখন তোমার উচিত আমাকে সাহায্য করা। ঘটকের খানের এক যুবতী মেয়ে ছিল। ঘটকের খান সংবাদ পেঁছা মাত্রই সে মজলিসে নিজের কুমারী মেয়েকে ডেকে পাঠান। তিনি দরবারে সকলের সামনে ওর মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলে বললেন ঃ আজ থেকে তোমার কোন ইয্যত বাকী রইলনা, যে পর্যন্ত উক্ত আফগানী মেয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয়। তোমায় ইয্যত তুচ্ছ বই কিছু নয়। এরপর থেকে ঘটকের খানের এ মেয়ের ফিৎনার অবসান না হওয়া পর্যন্ত একেবারেই মাথায় ঘোমটা থাকত না। দলবদ্ধ লোক রাতে তার সাথে যেত এবং গ্রামে গ্রামে নরনারীদের একত্রিত করে পশতু ভাষায় আফগানীদের লজ্জার বিষয় বলে লোকদের উত্তেজিত করত। এক এক রাতে এক এক গ্রামে যেত। এভাবে সে সব আফগানী এলাকায় হট্টগোল ছড়াল। এমনি অবস্থায় এক নির্দিষ্ট রাতে সকল সর্দারদের কতল করে দেয়া হলো এবং হুকুমতের পরিসমাপ্তি ঘটল।' অর্থাৎ জনাব সাইয়িদের নিয়োজিত অফিসার ও কর্মকর্তাদের হত্যা করা হল। ইন্নালিল্লাহি.....। (হিযব ওলী-উল্লাহ কী তারীখ কা মোকাদ্দামা)

"...বালাকোট একটি নৈসর্গিক দুর্গস্বরূপ। এর চারদিকে উঁচু পাহাড়ের সারি ঘিরে রেখেছে। হতভাগ্য মুসলমানদের পথ নির্দেশেই শের সিং এর বিশ হাজার ফৌজ চারদিক ঘেরা একটি জায়গায় বার শ' মুজাহিদের একটি জামায়াতের সাথে মহা-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। মুজাহিদীনরা নীচু এলাকা ছিলেন, শিখরা ছিল উঁচু জায়গায়। মল্লযুদ্ধ ছাড়াও শিখদের বিপুল সৈন্য পাহাড় হতে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। সাইয়িদ সাহেব, মাওলানা শহীদ, অন্যান্য আত্মবিসর্জনকারী মুজাহিদীন শিখফৌজের ভেতরে ঢুকে পড়েন এবং সকলেই শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। এ মর্মান্তিক ঘটনা ২৪ যিলকদ ১২৪৬ হিজরী মোতাবিক ৬ মে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ, জুমার দিনে জুমা'র নামাযের সময়ে সংঘটিত হয়। তখন সাইয়িদ সাহেবের বয়স ৪৬ বছর আর মাওলানা শহীদের বয়স ৫৩ বছর হয়েছিল।"
(হিযব ইমাম ওলীউল্লাহ দেহলবী কা ইজমালী তারীখ কা মোকাদ্দামা)

আল্লাহ্তালা ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন কওমের খারাবী চান, তখন তারা ফিরে আসেনা। আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ নাই সাহায্যকারী।

নয়শত বছর ইসলামী রাষ্ট্রের প্রদীপ এ উপ-মহাদেশে জ্বলছিল নিজের মতবিরোধ এবং বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে এ বাতি নিভে গেল।